শরৎচন্দ্র : এক আশ্চর্য কথাপুরুষ

শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক

“…পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
 নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে…
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
 তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ফুলে ওঠে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।”

রবীন্দ্রনাথের ‘সাধারণ মেয়ে’ কবিতার সাধারণ মেয়ে ‘মালতী’ শরৎচন্দ্রের ‘বাসি ফুলের মালা’ গল্পটি পড়ে এই কাতর আবেদন রেখেছিলেন লেখকের কাছে। কিন্তু শুধু তো মালতী নয়, বাংলার সাধারণ পাঠকসমাজ এইভাবেই তো একদিন আপন করে নিয়েছিল শরৎচন্দ্রকে। তাঁর কাহিনির চরিত্ররা বড় আপনার হয়ে উঠত সকলের। হাঁটতে হাঁটতে তারা অনায়াসে ঢুকে পড়ত পাঠকের মনের

গভীরে, দমকা হাওয়ায় কেঁপে ওঠা কোনও হ্যারিকেনের আলোর পাশে অতন্দ্র দুটি চোখ বেয়ে গড়িয়ে নামত জল, বুকের ভেতর অব্যক্ত যন্ত্রণার ছায়া ঘিরে ধরত ঘরের বদ্ধ বাতাসকে, সাদা কালো কিছু চলমান শব্দ যেন স্রোতের মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলত তাদের, আঁচলের খুঁটে বাঁধা চাবির গোছা হয়ে যেত নির্ভার, মনের মধ্যে জ্বালিয়ে দিত এক আশ্চর্য কৌতূহলের রংমশাল। এ-জীবন তো তাদের চেনা, এই অনুভূতি তো তাদের নিজের, এই বলা কথাগুলো তো তারা নিজের কানেই শুনে এসেছে বা শুনতে চেয়েছে কাছের মানুষ দূরের মানুষের থেকে, তাদের মুখ থেকে কীভাবে কথা চুরি করে নিলেন 'শরৎবাবু'? কী জাদুতে জেনে নিলেন তাদের মনের ইচ্ছে আর অনিচ্ছেদের, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণাদের? এইসব প্রশ্ন সেদিনের বাঙালির চিরচেনা উঠোনের পাশে একান্নবর্তী রান্নাঘরের উনুনের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। শিলেবাটা মশলার গন্ধের মতন, ফোড়ন আর আদা-লঙ্কার ঝাঁজের মতন লগ্ন হয়ে গিয়েছিল অস্তিত্বের স্বাদকোরককে। আটপৌরে মধ্যবিত্ত মন এভাবেই আঁকড়ে ধরেছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে। বাঙালির অন্তরমহলের সিংহাসনে অবিসংবাদিত অধিষ্ঠান ছিল তাঁর। আশ্চর্য তাঁর গল্প বলার রীতি, সহজ সরল তাঁর ভাষা। মনের গলিপথ জুড়ে কখনও তা ক্লান্তিহরণ ছায়া ঘনায়, কখনও আবার প্রতিবাদী মশাল জ্বালিয়ে দেয়, কখনও জ্যৈষ্ঠের দাহক্লান্ত সন্ধেতে বৃষ্টি নামায়, কখনও কার্তিকের বিষণ্ণ মাঠের মতো রিক্ত যন্ত্রণায় ভরিয়ে তোলে। তবু নিজেকে সেই চেনামহলে এক-একবার খুঁজে পেয়ে যে-পরিতৃপ্তি মেলে তার তুলনা কোথায়?

কিন্তু কীভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন শরৎচন্দ্র? কীভাবে পেরেছিলেন চরিত্রের হৃদয়ের স্পন্দনকে পাঠকের হৃদয়-স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে? যে-ব্যক্তিজীবন স্রোতে-প্রতিস্রোতে, ঘূর্ণি হাওয়া আর ঝড়ের তাণ্ডবে, প্লাবনে আর অনাবৃষ্টিতে বারবার এলোমেলো হয়ে গেছে, সয়েছে কত অবহেলা, অভাব, স্নেহহীন উপত্যকায় পরিভ্রমণের ক্লান্তি, সেই আশ্চর্য জীবনই তো তাঁকে নিয়ে গেছে মানুষের হৃদয়ের কাছে! তাই মানুষের আর মনুষ্যত্বের জয়গাথা তিনি লিখে গেছেন।

জীবনের জটিল পাঠ

মধ্যযুগের বাংলার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রাম। তার একটি মৌজা দেবানন্দপুর। শরৎচন্দ্রের বাবা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁদের পৈতৃক নিবাস কাঁচরাপাড়ার কাছে মামুদপুর থেকে পিতার দুর্ঘটনাজনিত অকালমৃত্যুর পর চলে আসেন মামার বাড়ি দেবানন্দপুরে। এখানেই ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ শরৎচন্দ্রের জন্ম। এখানেই তাঁর লেখাপড়ার সূচনা প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায়। তারপর সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের বাংলা স্কুলে তিন বছর পড়ে ছাত্রবৃত্তি নিয়ে চলে গেলেন মামারবাড়ি ভাগলপুরে । ১৮৮৭তে ভর্তি হলেন সেখানকার জেলা স্কুলে, পেলেন ডাবল প্রমোশন। কিন্তু অল্পদিনেই বাবার ডিহরির চাকরি চলে যেতে তাঁকে আবার ফিরতে হল দেবানন্দপুরে। ভর্তি হলেন হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ১৮৮৯ সালের ১০ জুলাই। বাড়িতে অভাব; আশ্রয় পেয়েছিলেন হুগলিতে, সম্পর্কে মেসোমশাই ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। অবশ্য কিছুদিন পরেই সেই আশ্রয়

হারালেন। বাড়ি থেকেই পায়ে হেঁটে অনেকটা দূরে হুগলি স্কুলে যাতায়াত শুরু হল। স্কুলের মাইনেও ঠিকমতো দিতে পারছিলেন না। দারিদ্র্য তীব্রতর হয়ে ওঠায় আবার ভাগলপুরে আশ্রয় নিতে হল সকলকে। ভর্তি হলেন তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ফার্স্ট ক্লাসে অর্থাৎ এখনকার ক্লাস টেন-এ। ছোটমামা বিপ্রদাস হ্যান্ড নোটে টাকা ধার করে পরীক্ষার ফি জোগাড় করে দিলেন। শরৎচন্দ্র বুঝলেন দারিদ্র্য কীভাবে স্বপ্ন কেড়ে নেয়, আত্মীয়দের কাছেও সম্মান থাকে না। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন তিনি।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রের দুটি দিক তাঁর শৈশব থেকেই প্রকট। সাহস আর মানবিকতা। যে-ইন্দ্রনাথকে তিনি চিরস্মরণীয় করে রেখে গেছেন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে, সেই ইন্দ্রনাথ চরিত্র তিনি গড়ে তুলেছিলেন শৈশবের বন্ধু রাজু--রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারকে কেন্দ্র করে। ভয়কে ভৃত্য করে মাছ চুরিই হোক বা অন্নদাদিদির সাপুড়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করা, অন্নদাদিদিকে উদ্ধারই হোক বা শ্মশানে রাত্রিযাপন, এসব ক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথের ছায়ায় ঢাকা পড়া তার বিশ্বস্ত সঙ্গীটির সাহসকে কি অস্বীকার করা যায় ? সেই তো স্বয়ং শরৎচন্দ্র, কিছুটা কল্পনা আর অনেকটাই বাস্তবের মিশেলে গড়ে ওঠা আশ্চর্য নায়ক। যে-শরৎচন্দ্র কৈশোরে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে মাঝিদের নৌকা খুলে হাল ধরে একা একা নৌকা চালিয়ে চলে যেতেন সরস্বতী নদী বেয়ে কৃষ্ণপুরে, রঘুনাথ গোস্বামীর আখড়া-বাড়িতে কীর্তন শুনতে, রাতবিরেতে কারও ওষুধের জরুরি প্রয়োজনে ছুটে যেতেন লাঠি আর লণ্ঠন হাতে হুগলি শহরে—তাঁর এই আলাদা মানবিক গুণের উপাদানগুলিই দানা বেঁধেছিল তাঁর সাহিত্যের চরিত্রে আর জীবন ভাবনায়।

শরৎচন্দ্রের মা ভুবনমোহিনী দেবী। ভাগলপুরের সচ্ছল পরিবারের এই কন্যা এমন এক সংসারে এসে পড়েছিলেন যেখানে আর্থিক সমস্যা বড় প্রকট। স্বামী তাঁর আত্মভোলা, বাঁধাধরা চাকরি করবার মর্জি তাঁর নেই, কল্পনা-বিলাসী, শিল্প-সাহিত্য চর্চায় অফুরন্ত উৎসাহী, ছবি আঁকা, গল্প-উপন্যাস-কবিতা লেখা, নাটক করা এসব নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসতেন। অর্থ উপার্জনে উৎসাহ তেমন ছিল না। ছোট থেকেই শরৎচন্দ্র দেখে এসেছেন তাঁর এই সর্বংসহা মাকে, মুখে কোনও অনুযোগ নেই, একান্নবর্তী পরিবারে খেটে চলেছেন দিনরাত, নানা গঞ্জনা সহ্য করছেন। বাপের বাড়িতে আশ্রিতা, কাজেই স্বাধীনতাহীনতায় থাকাটাকেই অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিলেন সহজে। কিন্তু তার জন্য স্বামীকে দোষারোপ না করে নীরবে তা সহ্য করেছেন। সেবাপরায়ণতা, কর্তব্যজ্ঞান আর শান্ত স্থিত ব্যক্তিত্বের আলোয় তিনি খরতপ্ত সময়ের মধ্যেও ছিলেন আশ্চর্যরকম স্থির। এই স্নেহময়ী মায়ের কর্তব্যজ্ঞান, সেবা, ত্যাগ, ভালবাসা আর সহানুভুতির স্রোতেই শরৎচন্দ্র নিমগ্ন করে রেখেছিলেন তাঁর 'মেজদিদি', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মামলার ফল' প্রভৃতি গল্পগুলিকে। পারিবারিক জটিলতার মাঝে মাতৃত্বের স্বার্থহীন মহিমা কীভাবে আলো ছড়িয়ে দেয়, কীভাবে সম্বলহীন অসহায় শিশু-কিশোররা আশ্রয় খুঁজে নেয় বাৎসল্যের স্নেহছায়াতে, সেইসব কাহিনির উৎসে আর চরিত্রের নির্মাণে ভুবনমোহিনী দেবীর অস্তিত্ব প্রভাব ফেলেছিল। 'পরিণীতা'র ভুবনেশ্বরীর ওপরেও যে তাঁর মা ভুবনমোহিনীর প্রভাব ছিল তা স্বীকৃত।

এন্ট্রান্স তো পাশ করলেন শরৎচন্দ্র, কিন্তু কলেজে পড়ানোর ক্ষমতা তো নেই তাঁর মামার বা বাবার। এইসময় এগিয়ে এলেন তাঁর মায়ের ছোট কাকিমা অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী কুসুমকামিনী দেবী। শরৎচন্দ্র তাঁর বড়ছেলে মণীন্দ্রনাথের সহপাঠী । মণীন্দ্র যাবে কলেজে আর অর্থাভাবে শরৎচন্দ্রের পড়া হবে না—এ হতে দেওয়া যায় না। তিনি তাঁর দুই ছোট ছেলে সুরেন্দ্রনাথ এবং গিরীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করলেন শরৎচন্দ্রকে। সম্পর্কে তাঁরা মামা হলেও শরৎচন্দ্রের থেকে বয়সে ছোট আর দুজনেই বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন তাঁর। বাড়ির বাকি ছোটরাও দলবেঁধে শরৎচন্দ্রের কাছে পড়তে আসত। বিনিময়ে যে-টাকা প্রাপ্য হত, তা তাঁর কলেজে পড়াশোনা বাবদ দিতে থাকলেন কুসুমকামিনী। হঠাৎই মা চলে গেলেন ইহলোক ছেড়ে । পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে কেবলমাত্র বড় বোন অনিলার বিয়ে হয়েছে তখন, বাকিরা খুবই ছোট। বাবা কিছুই করেন না, ঘরজামাই হয়ে আছেন। কিন্তু এবার তাঁর আত্মসম্মানে লাগল, খঞ্জরপুরে একটি টালির খোলার বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে । শরৎচন্দ্রও গেলেন। অর্থাভাব বাড়ল, পাঠ্যবই ছিল না, চেয়ে চিন্তে পড়তেন, তাও তৈরি হলেন এফ এ পরীক্ষা দেবেন বলে কিন্তু পরীক্ষার ফি যে কুড়ি টাকা, কে দেবে তা! অগত্যা পড়া ছাড়তে হল তাঁকে। বিত্তশালী বন্ধু সতীশচন্দ্রের সঙ্গে আড্ডা আর তাঁর আদমপুর ক্লাবে গান-বাজনা-অভিনয় নিয়ে হইচই করেই দিন কাটছিল তাঁর, অসাধারণ গানের গলায় মাতিয়ে রাখতেন সকলকে, খাওয়া দাওয়াও জুটে যাচ্ছিল সেখানে। এদিকে স্ত্রীবিয়োগের পর মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত তাঁর বাবা ছেলেমেয়েদের নিয়ে চরম বিপদে পড়লেন, তার ওপর ঋণ খেলাপের দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল হুগলিতে। বাধ্য হয়ে তিনি নিজের মামাকে দেবানন্দপুরের জমি-বাড়ি বিক্রি করে সেই টাকায় ঋণ শোধ করলেন। নিজের বলতে আর কিছুই রইল না। সর্বস্ব হারিয়ে পড়লেন অথই জলে।

বাধ্য হয়ে সংসারের হাল ধরতে চাকরি নিতে হল শরৎচন্দ্রকে কিন্তু তাতে তাঁর মন বসল না। কয়েক মাস পরে চাকরি ছাড়লেন। সংসারে আরও গভীর হল অর্থাভাব, বাবাও কিছু করেন না কিন্তু আত্মমর্যাদা প্রবল, কারও কাছে হাত পাততে রাজি নন, ফলে সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হল। বাবার থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন বাউন্ডুলে মন আর সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। বাবাও গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা লিখতেন কিন্তু সবগুলোই ছিল অসমাপ্ত। প্রতিভার যে গৃহিণীপনা ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া যায় না তার অভাব ছিল প্রবল। পরিত্রাণের উপায় নেই দেখে শরৎচন্দ্র এইসময় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেশের নানাপ্রান্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গও পেলেন, এসে পৌঁছলেন মজঃফরপুরে। সেখানে বাঙালি সমাজে অচিরেই এই সন্ন্যাসীর নাম ছড়িয়ে পড়ল গায়ক হিসেবে। জমিদার মহাদেব সাহুর সঙ্গেও পরিচয় হল। তাঁর আশ্রয়েই গানের আসরে আড্ডায় দিন কাটছিল তাঁর। এই সন্ন্যাসজীবন আর মহাদেব সাউ-এর সঙ্গে মজলিশের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসে।

সেখানে থাকতেই তিনি জানতে পারেন

দিনকয়েক আগে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে এবং সকলে তাঁর খোঁজ করছে। শোনামাত্র সন্ন্যাসের পাট চুকিয়ে ভাগলপুরে ছুটে এলেন তিনি—বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। প্রত্যক্ষ করলেন সংসারজীবনের নির্মম বাস্তবতাকে। দুটি ছোট ভাই একটি বোনকে নিয়ে কোথায় যাবেন? কী খাওয়াবেন? যে-বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তাঁরা, সেই বাড়ির মালিকের স্ত্রী মা-হারা ছোটবোন সুশীলাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। তার দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়ে নিলেন। শরৎচন্দ্র মেজভাই প্রভাসচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন এক আত্মীয়ের কাছে আসানসোলে। আর ছোটভাইকে পাঠিয়ে দিলেন জলপাইগুড়িতে, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাবার কাছে। নিজে চাকরির খোঁজে চলে এলেন কলকাতায়। চাকরি এবং আশ্রয় জুটল সম্পর্কিত মামা উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে, তাঁকে দেওয়া হল মামলার কাগজপত্র হিন্দি থেকে বাংলায় অনুবাদ করবার কাজ। কিন্তু আদালতের ভাষার সঙ্গে তেমন পরিচয় না থাকায় সুবিধে হল না, অচিরেই সেই কাজ ছাড়তে হল তাঁকে।

এই বাড়িতেই তাঁর পরিচয় হয় মাসি অন্নপূর্ণা দেবীর স্বামী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর কাছে রেঙ্গুনের গল্প শুনে, সেখানে কাজের সুযোগ আছে জেনে তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাউকে কিছু না জানিয়ে গোপনে জাহাজে চেপে রেঙ্গুন রওনা দিলেন। ভারতে তখন প্লেগ মহামারি তীব্র; সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সাধারণ শ্রেণীর সকলকে জাহাজ থেকে ভয়ঙ্কর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোয়ারান্টিনে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছিল। শরৎচন্দ্রকে সেই দুর্ভোগও সহ্য করতে হল তারপর খোঁজখবর করে, প্রায় কাঁদতে কাঁদতে অঘোরবাবুর বাড়িতে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে অবশ্য পরম সমাদর এবং আতিথ্য পেলেন; অন্নপূর্ণা দেবী নিজের জ্যাঠতুতো বোনের ছেলেকে পরম যত্নেই গ্রহণ করলেন। সেখানে আইন পড়ার পাশাপাশি একটা চাকরিও জুটে গেল মেসোমশাইয়ের সুপারিশে বর্মা রেলওয়ে অডিট অফিসে। কিন্তু এই সুস্থিতি দীর্ঘ হল না। ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে অঘোরবাবু চলে গেলেন ইহলোক ছেড়ে। অন্নপূর্ণা দেবী রেঙ্গুনের পাট তুলে চলে এলেন কলকাতায়। শরৎচন্দ্রের আইন পড়া আর শেষ হল না উপরন্তু চাকরিটাও চলে গেল। কিছুদিন পর বন্ধুদের সহায়তায় জুটে গেল কেরানির চাকরি, একজামিনার পাবলিক ওয়ার্ক্স অ্যাকাউন্টস অফিসে।

জীবনতরঙ্গ রে

রেঙ্গুনেই তিনি প্রথম বিবাহ করেন। দরিদ্র পরিবারের মাতৃহীন একটি মেয়ে, থাকতেন শরৎচন্দ্রের ভাড়া বাড়ির নিচের তলায়। তাঁর বাবা এক বৃদ্ধের হাতে তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন টাকার বিনিময়ে। তাঁদের ঘরেই আসর বসাতেন বাবা, সেই আসরে আসতেন সেই বৃদ্ধ। একদিন লোলুপ বৃদ্ধটির কবল থেকে নিস্তার পেতে মেয়েটি কোনওরকমে পালিয়ে আশ্রয় নেন শরৎচন্দ্রের ঘরে। শরৎচন্দ্র বাড়ি ফিরে মেয়েটির কাছে সব শুনে তাঁকে আশ্বস্ত করে চলে যান বন্ধুর বাড়ি। পরদিন ফিরে এসে তাঁর বাবাকে বলেন, তাঁর ঋণের টাকা তিনি পরিশোধ করে দেবেন, কিন্তু ওই বৃদ্ধের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে মেয়েটির জীবনকে নষ্ট করতে দেবেন না তিনি। মেয়েটির বাবা তখন শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন মেয়েটিকে বিবাহ করে তাঁকে দায়মুক্ত করতে, না হলে তাঁর জাত-

কুল রক্ষা পাবে না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির বিপদের কথা চিন্তা করে সম্মত হন শরৎচন্দ্র, বিবাহ সম্পন্ন হয়। শান্তি দেবীর সঙ্গে বিবাহিত জীবন শান্তিতেই কাটছিল। এক পুত্রসন্তানকে নিয়ে যখন পরিপূর্ণ তাঁর জীবন, সেইসময় প্লেগের সংক্রমণে মাত্র দুদিনের ব্যবধানে পুত্র এবং স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটে। পরিজনহীন রেঙ্গুনে বিপর্যস্ত শরৎচন্দ্র সেই সন্তপ্ত প্রহরে একা-একাই লড়াই করছিলেন। কিছু বছর পর শরৎচন্দ্র আর-এক দরিদ্র পিতার অনুরোধে হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেন।

প্রবাসজীবনে নানা জীবিকার বিচিত্র নারীপুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সূত্রে শরৎচন্দ্র চিনেছিলেন মানবজীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে। হীন প্রবৃত্তি, নীচ স্বার্থপরতার অন্ধকারের মাঝেও মানবিক অনুভূতি কীভাবে পাপড়ি মেলে তার সুলুকসন্ধান করেছিলেন তিনি। বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে গড়ে তুলেছিল এক আশ্চর্য জীবনদৃষ্টি, যার শিকড় ছড়িয়ে ছিল এই বাস্তব পৃথিবীতে অসংখ্য নামহারা মানহারা মানুষের হৃদয়ের গভীরে।

সাহিত্যের জীবন : জীবনের সাহিত্য

শরৎচন্দ্র ছোট থেকেই বাবাকে দেখেছেন গল্প, উপন্যাস লিখতে। সাহিত্যসৃষ্টিতে নিমগ্ন মানুষটির ছায়াতে বেড়ে ওঠা শরৎচন্দ্রের মনে উত্তরাধিকারসূত্রে জন্ম নিয়েছিল এক কারুবাসনা। সতেরো বছর বয়সে যখন তিনি হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের ছাত্র তখন 'কাকবাসা' এবং 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে দুটো ছোটগল্প লেখেন। বাল্যবন্ধু কাশীনাথের নামে কাশীনাথ গল্পের সূচনাও তিনি করেছিলেন এইসময়েই। পরবর্তী কালে বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টদের বাড়িতে সাহিত্যের প্রতিবেশ তাঁর প্রতিভার বিকাশ ও বিবর্তনে সাহায্য করেছিল। মামা গিরীন্দ্রনাথের অনুরোধে কুন্তলীন কেশ তেলের বিজ্ঞাপনের জন্য শরৎচন্দ্র তাঁদের বৌবাজারের বাড়িতে বসে 'মন্দির' গল্পটি লেখেন, ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু গল্পটি তিনি জমা দেন আর-এক মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে। জমা দিয়েই তিনি পরিজনদের না জানিয়ে বার্মা চলে যান, এবং বলে যান যে যদি এই গল্প পুরস্কার পায় তাহলে যেন তাঁর জন্য মোহিত সেন প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী দেওয়া হয়। যখন বিশিষ্ট সাহিত্যিক জলধর সেনের বিচারে 'মন্দির' গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কার পেল; তখন তিনি বার্মায়। গল্পটি 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' নামে যে সংকলন প্রকাশিত হয় সেই সংকলনে স্থান পায় সুরেন্দ্রনাথের নামে। এটি শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গল্প। জলধর সেন মন্তব্য করেছিলেন, "এই লেখক যদি চর্চা রাখেন তাহলে ভবিষ্যতে যশস্বী হবেন।"

কিন্তু তারপর এক দীর্ঘ ব্যবধান। জীবনের দুর্গম পথে মানব চরিত্রের বিচিত্র গতিপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়—তাঁর পরবর্তী সাহিত্য রচনার ভিত্তি প্রস্তুত করলেও রচনার অবকাশ তাঁর ছিল না। বাঙালি পাঠক শরৎচন্দ্রের প্রতিভার প্রথম খোঁজ পেল যখন ভারতী পত্রিকায় তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হতে শুরু করে। এটি প্রকাশের প্রেক্ষাপটও নাটকীয়। বন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে বিভূতিভূষণ ভট্টর বাড়ি থেকে শরৎচন্দ্রের লেখা গল্পের খাতাদুটি এনেছিলেন পড়বার জন্য, তা ফেরত দেবার আগে তিনি কাহিনিটি নিজের খাতায় টুকে রাখেন। সে কাহিনি সম্ভবত শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন ১৯০১ বা

১৯০২ সালে বিভূতিভূষণ ভট্ট এবং তাঁর বোন নিরুপমা দেবীর বাড়িতে, কারণ ভাগলপুরে প্রায় নিরাশ্রয় শরৎচন্দ্র তখন দিনের অনেকটা সময় তাঁদের বাড়িতেই থাকতেন, খাতাপত্রও ওখানেই রাখতেন। লাহোর যাবার আগে সরলা দেবী যখন সৌরীন্দ্রমোহনের হাতে আবার নিয়মিতভাবে ভারতী প্রকাশের এবং ভার দিলেন তখন ধারাবাহিক গল্পের খোঁজ পড়ল। তখন তিনি তাঁর বন্ধু শরৎচন্দ্রের লেখা গল্পটি সরলা দেবীর হাতে দিলেন। গল্প পড়ে আপ্লুত সরলা দেবী সেই গল্প ছাপাতে অনুমতি দিলেন ঠিকই, কিন্তু আড়ালে রইল এক দুর্দান্ত ব্যবসায়িক পরিকল্পনা। পরপর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ দুটি সংখ্যায় গল্প ছাপা হল লেখকের নাম ছাড়াই। সকলে ভাবলেন এই অসাধারণ কাহিনি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই লেখা সম্ভব। কৌতূহল বাড়ল, পাল্লা দিয়ে বিক্রিও বাড়ল। শেষ পর্যন্ত আষাঢ় সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হল। পাঠক বিস্মিত। ১৯০৭ সালের জুন-জুলাই মাসে এসব কাণ্ড ঘটছে, লেখক হিসেবে শরৎচন্দ্রের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অথচ তিনি এসব কিছুই জানেন না। তাঁর অনুমতি না নিয়েই তাঁর কাহিনি ছাপা হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়। পরে অবশ্য অনুমতি নিয়েছিলেন বাল্যবন্ধু সৌরীন্দ্রমোহন, যাঁর আর-একটি পরিচয় তিনি সুচিত্রা মিত্রের বাবা এবং কীর্তিবাস কৃত্তিবাসের উত্তরপুরুষ।

'বড়দিদি' প্রকাশের পর থেকেই সাহিত্যিক মহলে শরৎচন্দ্রের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আসতে থাকে অনুরোধ, ধীরে ধীরে লেখালেখিতে আগ্রহ বাড়তে থাকে তাঁর। সামাজিক অভিজ্ঞতা, কাহিনি নির্মাণের ক্ষমতা, সহজ সরল গতিশীল ভাষায় সাধারণের অনুভূতিকে ছুঁয়ে যাবার জাদু তাঁর অধিগত ছিল। 'বড়দিদি'র অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা তাঁকে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা এনে দিল, রেঙ্গুন থেকে লিখে পাঠালেন 'রামের সুমতি' গল্প আর 'নারীর লেখা' নামে একটি প্রবন্ধ, যা 'যমুনা' পত্রিকাতে ছাপা হল ১৩১৯ বঙ্গাব্দে, ফাল্গুন এবং চৈত্র সংখ্যায়। কিন্তু একই নামে প্রবন্ধ, ছোটগল্প, বড়গল্প ছাপা হলে লোকে মনে করতে পারে যে 'যমুনা' পত্রিকায় একজনই লেখক লেখেন। তাই শরৎচন্দ্র চিঠি লিখে জানালেন ছোটগল্পগুলি তাঁর নামে ছাপা হলেও প্রবন্ধ ছাপা হবে 'অনিলা দেবী' এবং বড়গল্প ছাপা হবে 'অনুপমা' ছদ্মনামে। 'যমুনা'য় পরপর প্রকাশিত হল 'পথনির্দেশ' আর 'বিন্দুর ছেলে', ধারাবাহিকভাবে 'চরিত্রহীন' উপন্যাস। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্য বন্ধুর অনুরোধে পাঠালেন 'বিরাজ বৌ'। 'ভারতবর্ষে' পরপর ছাপা হল 'পণ্ডিতমশাই', 'আঁধারে আলো', 'দর্পচূর্ণ' এবং 'মেজদিদি'।

এইসময় রেঙ্গুনের আবহাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছিল না, পা ফুলে যাচ্ছিল। হাঁটতে পারছিলেন না। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসবেন বলে দরখাস্ত করলেন। এই নিয়ে ইওরোপীয় বড়কর্তা তাঁকে অপমান করলে ক্রুদ্ধ শরৎচন্দ্র তাঁর টেবিলের রুলটি তুলে নিয়ে তাঁকেই মারতে উদ্যত হলেন; শেষ পর্যন্ত মারলেন না কিন্তু চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ব্রহ্মদেশ ছাড়লেন চিরতরে। বার্মায় ঘটনাবহুল দীর্ঘ তেরো বছর তিন মাস কাটিয়ে ফিরে এসে উঠলেন হাওড়ার বাজে শিবপুর অঞ্চলে, ১৯১৬ সালে। ১৯২৬ সালে চলে গেলেন রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড়েতে। ইতোমধ্যে মেজভাই প্রভাসচন্দ্র আসানসোলে রেলের চাকরি ছেড়ে যোগ দিয়েছিলেন বেলুড়

মঠে, স্বামী বেদানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র কলকাতায় এলে সন্ন্যাসী ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে নিয়মিত বেলুড় মঠে যেতেন। ১৯২৬ সালে সামতাবেড়েতেই দাদার সঙ্গে দেখা করতে যান স্বামী বেদানন্দ, জ্বরে পড়েন এবং একদিনের মধ্যে দাদার কোলেই দেহত্যাগ করেন। বাড়ির পাশেই তাঁকে দাহ করে এক সমাধি মন্দির স্থাপন করেছিলেন শরৎচন্দ্র। মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন ভাইয়ের অকালবিয়োগে।

শিবপুরে থাকার সময় সাহিত্য এবং রাজনীতি দুই নিয়েই মেতে ছিলেন শরৎচন্দ্র। দেশবন্ধুর সহযোগী হিসেবে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন; ১৯৩৬ পর্যন্ত একটানা হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি থাকেন। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের মতবিরোধ প্রকট হয়, তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চলতে থাকে। সেই দুর্দিনে সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর যে-মানুষটি তাঁর পাশে ছিলেন তিনি শরৎচন্দ্র। অহিংস পথের পথিক হলেও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সশস্ত্র আন্দোলনের নেতাদের সুসম্পর্ক ছিল। এব্যাপারে দেশবন্ধুর নিষেধ ছিল তবু দেশের প্রতি যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁরা শরৎচন্দ্রের হৃদয়ের অনেকখানি স্থান এবং সমর্থন অধিকার করেছিলেন। জালালাবাদ পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা সূর্য সেনের সাহায্যের জন্য কল্লোল পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ তাঁর কাছে কালীপদ ভট্টাচার্যকে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি সামতাবেড়েতে পাঠিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র সেদিন তাঁর বাড়িতে যত টাকা ছিল, সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা কালীপদর হাতে তুলে দেন। বলেন, তাঁর ‘পথের দাবী’র সব্যসাচীকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে সূর্য। হাওড়ার নানাপ্রান্তে তখন বিপ্লবীরা গোপনে লুকিয়ে থাকতেন। সালকিয়া, ডোমজুড়, শিবপুরের সেইসব গোপন আস্তানায় তাঁদের খাওয়া-থাকার খরচ বহনেও শরৎচন্দ্র অকৃপণ সাহায্য করতেন।

জীবনের কথা : কথার জীবন

কাহিনি নির্মিতির পরে চরিত্র নির্মাণ নয়, চরিত্র অনুযায়ী কাহিনির গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে শরৎচন্দ্র পৌঁছে যেতেন মানুষের হৃদয়ে। এই পৌঁছে যাবার পথ করে দিত তাঁর ভাষা, সে-ভাষা মধ্যবিত্ত মানুষের সাধ-স্বপ্নকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেদনাকে আঁকড়ে ধরে প্রেম-বিচ্ছেদের অনুভূতিকে সরাসরি পৌঁছে দিত বৃহত্তর পাঠকসমাজে। আধুনিক সমালোচকের মতে তাঁর সাহিত্য গঠন-নৈপুণ্যের কাঙ্ক্ষিত শিখর ছুঁতে পারেনি। কিন্তু তিনি যে-মায়ায় বাঙালিকে গল্প শুনিয়ে গিয়েছেন, যে-সম্মোহনী দক্ষতায় শব্দ গেঁথে গেঁথে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন তার তুলনা তিনিই। আসলে তাঁর শিকড় নিহিত ছিল সেইসব হেরে-যাওয়া প্রতিদিন নানাভাবে যন্ত্রণাবিদ্ধ হওয়া মানুষের সমাজে, তাদের প্রতি ছিল তাঁর আশ্চর্য সহানুভূতি। নিজেও তাদেরই একজন ছিলেন বলে সহজেই সেই অব্যক্ত কথামালাকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারতেন। চিরচেনা এক-একটি চরিত্র আর ঘটনা, পরিণতিতেও মধ্যবিত্তের সহজ সমীকরণের মতো চেনা উত্তর—তাঁর কাহিনিকে সাধারণ মানুষের অসুখী গৃহকোণে স্থান দিয়েছিল। একান্নবর্তী পরিবারে স্বার্থের সংঘাত, নারীর মহত্ত্বকে স্বীকৃতি দান, এইসবের মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসতে-চাওয়া মন যেন উড়ান খুঁজে নিয়েছিল। আর সেই বদলে-

যাওয়া সময়ে দাঁড়িয়ে নারীর মূল্যায়নে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি আনলেন তিনি। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ রইল না—হিন্দি, ওড়িয়া, গুজরাতি, মৈথিলি, তামিল, তেলুগু, উর্দু, কন্নড় সব ভাষাতেই তাঁর লেখা অনূদিত হল। বিংশ শতকে দুই এবং তিনের দশকেই গড়ে উঠল এক বৃহত্তর পাঠকসমাজ। কিন্তু শুধু অনুবাদেই তিনি বেঁচে রইলেন না—ভারতীয় সাহিত্যের লেখকেরা তাঁর কথনরীতিকে অনুসরণ করে যে-কাহিনি বয়ন করলেন, যে স্বীকৃতি দিলেন, সেখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

ভারতীয় জনগণ-মনে তাঁর পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল অভাবনীয়। মারাঠি ভাষায় চন্দ্রকান্ত কাকোডকর, মালতীবাঈ বেডেকর, শকুন্তলা পরাঞ্জপে প্রমুখের রচনায় সেই

সামতাবেড়ে গ্রামে

প্রভাব আছে; মৈথিলিতে হরিমোহন ঝা, বৈদ্যনাথ মিশ্র, রমানন্দ লাল রেণুর রচনাকে চালিত করেছে তাঁর সমাজদৃষ্টি। গুজরাতি সাহিত্যে পান্নালাল প্যাটেল, চুনিলাল মাদিয়া, শিবকুমার যোশী, রমণলাল দেশাই-এর রচনায় যে-নারীদের খুঁজে পাওয়া যায় তাঁদের আচরণ, ভঙ্গি, বিদ্রোহী সত্তা শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের আদর্শেই গড়া। ১৯২১ সালে গুজরাতি ভাষায় শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের কৃষ্ণপ্রসাদ মণিশঙ্কর শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গান্ধিজীর অনুরোধে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব মহাদেব দেশাই 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' এবং 'মেজদিদি'র অনুবাদ করেন। বাৎসল্যের সেইসব আশ্চর্য আখ্যান গুজরাতে ভীষণ জনপ্রিয় হয়। সাহিত্যিক স্নেহরশ্মি তাঁর 'তুটেলা তার' (১৯৩৫) উপন্যাসের ভূমিকায় শরৎচন্দ্রের কাছে ঋণস্বীকার করেছিলেন। তবে শরৎচন্দ্রকে সব থেকে বেশি আপন করে নিয়েছিলেন তাঁর হিন্দিভাষী পাঠকেরা। প্রেমচন্দের সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনভাবনার সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল ছিল বিস্ময়কর। বঞ্চিত মানুষ, নারীদের দুর্দশার কথা দুজনেই অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

বিশেষত নারীর অব্যক্ত যন্ত্রণা, সামাজিক বঞ্চনা আর বেদনার আখ্যানকে সাহিত্যের আঙিনায় প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কৃতিত্ব শরৎচন্দ্রের। নারীরা যেন শরৎচন্দ্রকে নিজেদের মুখপাত্র হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, ফলে তাঁর সাহিত্যের জনপ্রিয়তা অকল্পনীয় উচ্চতা স্পর্শ করেছিল। এক বিবেকী অস্তিত্ব দিয়ে তিনি মানুষকে পরিমাপ করেছিলেন; হৃদয়ধর্মই ছিল তাঁর সাহিত্যের মূলকথা। তিনি পেরেছিলেন সাহিত্যকে জনমনের কাছে পৌঁছে দিতে, যে-মন কল্পনায় প্রতিবাদ আঁকে, তীব্র ক্ষোভে মুখর হয়ে উঠতে চায় কিন্তু দোটানায় আর স্বার্থচিন্তায় পিছিয়ে আসে—বাস্তবে সে যেন এক 'সব পেয়েছির দেশ' খুঁজে পায় শরৎসাহিত্যে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাতান্নতম জন্মদিনের প্রতিভাষণে যে-কথা বলেছিলেন সেই বহুশ্রুত কথাগুলি স্মরণ করেই তাই আলোচনার ছেদ টানি : "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই... এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে...।"

কাঠের দেরাজে কাচের আড়ালে ঘরের অন্দরসজ্জায় শুধু অপরিহার্য উপাদান নন শরৎচন্দ্র, তিনি মানুষের হৃদয়ের উঠোনে শীতলপাটি বিছিয়ে নিয়েছেন অবলীলায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ ছন্দে তাঁর কথাস্রোত আমাদের চৈতন্যে আনে নদীস্রোত, যে-স্রোতে ভেসে যায় মন, সব চাওয়া-পাওয়া। মিলে যায় দেনা-পাওনার হিসেব । নি

সহায়ক গ্রন্থ

১। গোপালচন্দ্র রায়, *শরৎচন্দ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০

২। কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ সংখ্যা ১৪০৮